১০

বাংলাদেশের রাজনীতি

ভূমিকা

১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণদান এবং অপরিমেয় সম্পদ হানির বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। পাকিস্তানী সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রত্যাখান করে একটি গণতান্ত্রিক ও সিভিল সমাজের আধিপত্য ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন রাষ্ট্রে বাঙালিদের কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি বরং অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের ফলে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ কর্তৃক শোষণের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠতে থাকে। এবং তখন থেকেই বাঙালিরা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এ সবই অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের সংগ্রামের প্রমাণ। এ সব আন্দোলন সংগ্রামেরই সর্বশেষ পরিণতি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিলো সামরিক আমলাতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রীয় শোষণ বঞ্চনার পরিবর্তে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা। এ সব স্বপ্ন-সাধ ধারণ করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও বাঙালি জনগোষ্ঠীর সব স্বপ্ন পূর্ণ হয় নি। স্বাধীনতার তিন দশকেও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয় নি। গণদারিদ্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সামরিক শাসকগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ ছাড়া সংবিধানের অনাকাঙ্ক্ষিত সংশোধনী, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের ফলে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমূহকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, সেগুলো অপূর্ণ রয়ে গেছে।

'মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি' শীর্ষক ইউনিটকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- ***পাঠ-১:*** *আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৭২-৭৫)*
- ***পাঠ-২:*** *বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ*
- ***পাঠ-৩:*** *সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া: জিয়া ও এরশাদ শাসনামল*
- ***পাঠ-৪:*** *১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন।*
- ***পাঠ-৫:*** *বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও রাজনীতি (১৯৯১-২০০১)।*

পাঠ - ১

আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৭২-৭৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- রাষ্ট্রপরিচালনায় আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য

১৯৭১ সালে সফল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সহানুভূতির পাশাপাশি এর স্থায়িত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ তৈরি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী, জনসংখ্যার আধিক্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি, অসংগঠিত প্রশাসনিক রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে। নিম্নে কয়েকটি সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সংবিধান প্রণয়ন

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র নয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ধারণকারী একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম সাফল্য। সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি 'অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ' জারি হয়। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ঠ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করেন এবং ৪ নভেম্বর তা গণপরিষদে গৃহীত হয়। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মূল স্তম্ভরূপে বর্ণিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন

১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের কয়েকদিনের মধ্যেই প্রবাসী সরকার দেশে ফিরে আসে। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে এসে সরকারের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন এবং নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সক্রিয় দোষর, দালাল এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনার ঘোষণা দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ত্বরিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৭২ সালেই অর্থনীতি পূর্ব বছরের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে থাকে। এ ছাড়াও দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়, রক্তপাতের আশংকা অমূলক প্রমাণিত হয় এবং বাংলাদেশ সাতানব্বইটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম বছরটি মিশ্র সাফল্যের বলে মনে করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং রাজনৈতিক কাঠামো তৈরির জটিল প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ

স্বাধীনতার পরও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ জানুয়ারী, ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দানের আহবান জানান। এ জন্য দশদিন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করেন। ৩০ জানুয়ারী সারা দেশ থেকে আগত প্রায় ৫০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা ঢাকায় অস্ত্র সমর্পণ করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন।

ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাবর্তন

বিজয় লাভের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাবর্তন আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, কোন দেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকারী বিদেশি সৈন্য স্বাধীনতার পরেও বছরের পর বছর থেকে যায়। এর ফলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ সরকার এ বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভারত সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ১২ মার্চ, ১৯৭২ সকল ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন কর্মসূচি

যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় ধবংস হয়ে যায়। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসন এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারত থেকে প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থী পুর্নবাসন, ৪.৩ মিলিয়ন বাড়ি ঘর মেরামত ও নির্মাণ, যুদ্ধে গৃহহীনদের আশ্রয় ব্যবস্থা, নিরুপায় জনসাধারণের জন্য জমি, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের যোগান দান ইত্যাদি গুরুত্ব সমস্যা মোকাবেলা জন্য সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। এ ছাড়াও নতুন নতুন এজেন্সী তৈরি করা হয়। জাতিসংঘ সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বিপুল সাহায্য লাভে সরকার সফল হয়। ১৯৭৩ সালের মার্চে জাতীয় বাজেট ঘোষিত হয় এবং একটি পাচঁশালা পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আওয়ামী লীগ সরকার নির্ধারিত সময়ের আগে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে। এ নির্বাচনের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা অনুশীলনের পথ উন্মুক্ত হয়। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টি আসন লাভ করে।

বৈদেশিক নীতি ও জোট নিরপেক্ষতা

আন্তজাতিক রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার জোট নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়াস চালান। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য তিনি 'জুলিও কুরি' পুরস্কার লাভ করেন। বৈদেশিক সাহায্য এবং কুটনৈতিক স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে সরকার সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ও ইসলামি ঐক্য সংস্থার (OIC) সদস্যপদও লাভ করে। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়- আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত এই পররাষ্ট্র নীতি বিশ্বব্যাপী প্রশংসা পায়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতি বাঙালিদের নিরংকুশ আস্থার কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম দিকে তেমন কোন সমস্যা হয় নি। বরং সমগ্র পরিস্থিতির উপর সরকার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। কিন্তু এই স্থিতিশীল অবস্থা দীর্ঘদিন টিঁকতে পারে নি। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পক্ষ বিভিন্ন কৌশলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করে। এছাড়া ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশি ষড়যন্ত্র।

অর্থনৈতিক দূর্দশা

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সে সাথে জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনও ছিলো মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনৈতিক অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়নে নানরূপ সমস্যা ও সংকটের মখোমুখি হয়। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিবধস্ত অর্থনীতি এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতার অভাব প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। ফলে দ্রব্যমূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিপায়। আমদানি রপ্তানির ব্যবধান বেড়ে যায়। জিডিপি কমে যায়, উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, সমন্বয়ের অভাব, মুৎসুদ্দী শ্রেণীর দৌরাত্ম্য, অসাধুদের

দুর্নীতি, ইত্যাদি কারণে আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করলেও সেগুলোর যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু সকল কল কারখানা জাতীয়করণ করায় এক ধরনের সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় ও জাতীয়করণসম্পন্ন শিল্প-কারখানাগুলো কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনে সক্ষম হয়নি। দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে একদল ঘাতক খুনী স্বপরিবারে হত্যা করে।

যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধের বিচারের ঘোষণা দেন, যা ছিল বাঙালি জাতির দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বিচার সংগঠিত হয়নি এবং বঙ্গবন্ধু কয়েকটি নির্দিষ্ট অপরাধ বাদে অন্যান্য অভিযুক্তদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইন পাস করেছিল, '৭৫-র পরবর্তী কালে জেনারেল জিয়ার সরকার ঐ আইন বাতিল করে দেয়। এর সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধিরা অবাধ জীবন যাপনের সুযোগ পায় এবং বিভিন্নভাবে সংগঠিত হতে থাকে।

বাঙালি জাতি এখনও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার এবং ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে প্রস্তাব পাস হয়েছে। সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

সারকথা

স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনা শুরু করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যার ভেতর দিয়ে শাসনের সাফল্যের অগ্রগতি থেমে যায়। গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাবর্তন, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান -আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যে নমুনা রূপে দেখা যেতে পারে। সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠন মূলত কর্মকান্ড সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। কবে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ?

ক) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর খ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর

গ) ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর

২। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি কত জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র জমা দেন ?

ক) ২০ হাজার থ) ৩০ হাজার

গ) ৪০হাজার ঘ) ৫০ হাজার

৩। কবে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে ?

ক) ১১ মার্চ, ১৯৭২ খ) ১২ মার্চ,১৯৭২

গ) ১৩ মার্চ, ১৯৭২ ঘ) ১৪ মার্চ, ১৯৭২

উত্তর মালা :- ১। খ, ২। ঘ, ৩। খ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র পরিচালনায় আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৭২-৭৫)সাফল্যসমূহ বর্ণনা করুন।

২। (১৯৭২-৭৬) আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সামরিক শাসনের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ একে একে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তীতে এ সব দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ অথবা সামরিক বাহিনী কর্তৃত্ব ক্ষমতা দখল অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ৮০' র দশক পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তানী সেনা-আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বেসামরিক-সিভিল শাসন প্রতিষ্ঠার মানসে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করে। তথাপি স্বাধীনতার তিন দশকের অর্ধেকের বেশি সময় দেশটি দু'জন সামরিক শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সামরিক শাসক আক্রান্ত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কয়েকটি কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শীতা: বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পরই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যা তৈরি হয়। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা ইত্যাদি সমস্যা সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফলে সামরিক বাহিনীর কতিপয় জুনিয়র সদস্যের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। এর ফলে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয় ও সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। পূর্বোক্ত কারণগুলো ছাড়াও পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রপরিচালনায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বাংলাদেশের সামারিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের প্রেরণা দেয়।

সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব : স্বাধীনতা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সেনা সদস্য এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সেনা সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। স্বাভাবিক কারণেই সরকার মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয় । ফলশ্রুতিতে অমুক্তিযোদ্ধা অংশটি সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে সেনাবাহিনীর এ অংশটি জড়িত হয়।

বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়নি। প্রাক্তন উপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঋণ, সাহায্য, অনুদান, উন্নয়নের তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে এ দেশগুলোকে নির্ভরশীল করে তোলে। স্বাধীনতার পর অন্যান্য অনুন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও সরকার জাতীয়করণ নীতিসহ এমন কিছু পলিসি গ্রহণ করে যা বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বার্থকে বিঘ্নিত করে। এমতাবস্থায় বৈশ্বিক পুঁজিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সামরিক বাহিনীর একটি অংশকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা ঘটানো হয়।

বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি: স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে সমগ্র বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী ব্লকে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও বাংলাদেশ শুরু থেকে জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে তথাপি মুক্তযুদ্ধ চলাকালিন সাহায্য সহযোগিতার কারণে সোভিয়েত ব্লকের সাথে অধিক ঘনিষ্ট হয়। বাংলাদেশের উপর পুঁজিবাদী বিশ্বের কর্তৃত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটানো হয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেড় দশক কাল বাংলাদেশে সামরিক শাসন চলেছিল। এ সামরিক শাসন ছিল কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ। সামরিক শাসন কালে সংবিধান, আইনের শাসন, বিচার বিভাগ, ব্যক্তি ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একে সহায়তা করেছে বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক চক্র। সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে বেসামরিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হয় নি। ১৯৭৫ সালে প্রথম সামরিক সরকারের শুরু থেকেই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসহ সরকার ও প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিকায়নের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়। জেনারেল এরশাদের আমলে এ প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

- জিয়া শাসনামলে সামরিক সদস্যদের অনেকে কর্মরত অবস্থায় সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। এঁরা জনদল, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য হয়েছেন। তেমনি এরশাদ আমলেও সেনা সদস্যরা জনদল, ফ্রন্ট ও জাতীয় পার্টির সদস্য হয়েছেন।
- বাংলাদেশ সংবিধান এবং সেনা আইনের ২৯২ ও ২৯৩ বিধিদ্বয় অমান্য করে জিয়াউর রহমান নিজের ইচ্ছামত সামরিক ফরমান জারি করে সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হন। একই ভাবে এরশাদ ও ক্ষমতা দখলের চার বছর পর সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
- জিয়াউর রহমানের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারবর্গ এবং জাতীয় চার নেতা হত্যাকারী সামরিক সদস্যদের চাকরি দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে পাঠিয়ে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারও এদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেন। এ ধরনের আরো অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা ও নিয়োগ দানের মাধ্যমে সামরিক শাসন আমলে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনের সামরিকীকরণ করা হয়।
- জিয়া এবং এরশাদ শাসনামলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক হারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও বেসামরিক পদ দেওয়া হয়। এরশাদ আমলে সতেরো জন সামরিক অফিসার মন্ত্রী হন। এদের মধ্যে কয়েকজন সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় মন্ত্রী পদে ছিলেন।
- ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারের মধ্যে ২৩ জন সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন।
- ১৯৮৮ সালে এরশাদ পুরোনো মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ছিলেন সামরিক বাহিনীর অফিসার।
- এরশাদ শাসনামলে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ অন্য সব মন্ত্রণালয়, পুলিশ বিভাগ, বিভিন্ন কর্পোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় শীর্ষপদসমূহের অধিকাংশে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়।
- এরশাদ আমলের মাঝামাঝি সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি এবং বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
- রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের নিমিত্ত হিসেবে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করে ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে পবিত্র ধর্মের প্রতি কার্যত অবিচার করা হয় এবং রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক শক্তির অন্ধকার গহব্বরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে সামরিক শাসনের ফলাফল

যদিও বিশ্বের প্রতিটি দেশের সামরিক শাসকরা তাদের শাসনকালকে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের কাল হিসাবে বর্ণনা করেন, বস্তুত সামরিক শাসনামলে উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক পরিস্থিতি সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়। ১৯৬০ ও ৭০'-এর দশকে ৭৭ টি দেশের উপরে গবেষণা করে এরিখ নর্ডলিংগারস (Eric Nordlingers) এবং বিভিন্ন গবেষক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সমাজ পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখে না। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা যাচাই করলে একই ফল পাওয়া যায়। সামরিক শাসনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থিতিশীলতা কোনটিই অর্জিত হয়নি। রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল হয়েছে। বারংবার সংবিধান লংঘিত হয়েছে। সামরিক শাসনের কয়েকটি ফল নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি (১৯৭২-৮১)

মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৯৭৯ সালের মূল্য ও বিনিময় হারে)

দেশ	১৯৭২	১৯৮১	পরিবর্তনের হার
বাংলাদেশ	৪৯	১৪০	১৮৬%
ভারত	৩৪৫৫	৩৯৯১	১৬%
পাকিস্তান	১০৭০	১৩০৭	২২%

উৎস : B. K. Jahangir, 'Problematics of Nationalism in Bangladesh', 1986

ছক থেকে দেখা যাচ্ছে উপমহাদেশে ১৯৭২-৮১ সময়কালে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

অর্থনৈতিক ফলাফল (১৯৮২-৯০)

- সামরিক শাসনামলে কখনোই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
- ৮৩% মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করেছে।
- প্রতি নয় হাজারে একজন ডাক্তার।
- জাতীয় সঞ্চয় হার শতকরা ২ ভাগে নেমেছে।
- বৈদেশিক ঋণ বাবদ গৃহীত ৩৭ হাজার কোটি টাকা শোধ করতে ৮শত বছর লাগবে।
- খাদ্য ভর্তুকির শতকরা আশিভাগ সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর. ও পুলিশ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। গরিব ও স্বল্প আয়ের মানুষের রেশন ও খাদ্যের দাম ক্রমাগত বেড়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস : বাংলাদেশে বারংবার সামরিক আইন জারি, অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, সংবিধান লংঘন ও সংশোধন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিনষ্ট করার ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দুর্বল হয়। মার্শাল'ল প্রোক্লেমেশন এবং সংবিধানের ৫ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম সংশোধনীর অধীনে রাষ্ট্রের সামরিকীকরণ ঘটে। সামরিক শাসক বিরোধী আন্দোলনসমূহ অগণতান্ত্রিক পন্থায় দমনের ফলে রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সমাজ গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বচছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় সরকারি কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা প্রাধান্য পায়। সংবিধানের প্রাধান্য ও আইনের শাসন নষ্ট হয়। বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর একচেটিয়া উপস্থিতি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির প্রসার ঘটায়।

সারকথা

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশ ও দীর্ঘকাল সামরিক বাহিনী দ্বারা শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনীতিকদের অদক্ষতা, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার মোহ, বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন কালে রাষ্ট্র ও সরকারের সকল স্তরে সামরিকায়ন ঘটে। এর ফলে সংবিধান লংঘিত হয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে দুর্দশা তৈরি হয়। আইনের শাসন, সুষ্ঠু নির্বাচন ও বিচারের বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। সেনাবাহিনী কবে প্রথম বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে ?
ক) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
খ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর
গ) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী
ঘ) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

২। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদের নবগঠিত মন্ত্রিসভার ৭ জন সদস্যের কতজন সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন?
ক) ৫ জন
খ) ৬ জন
গ) ৭ জন
ঘ) ৮ জন

৩। বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর একচেটিয়া উপস্থিতির ফলে কি হয় ?
ক) প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়
খ) প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়
গ) আমলাদের দক্ষতা বাড়ে
ঘ) সেনাবাহিনীর দক্ষতা বাড়ে

উত্তর : ১। ঘ, ২। গ, ৩। ক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের ফলাফল আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া : জিয়া ও এরশাদ শাসনামল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশে সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- এরশাদের সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের নেতৃত্বে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই হত্যার ফলে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনাবসান ঘটে। খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে একটি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। যারা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন তারা বঙ্গভবনে থেকে 'ক্ষমতা পরিচালনা' করতে থাকেন। ফলে সেনাবাহিনীতে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) সেনাবাহিনীর একটি অংশ বিদ্রোহ করে। তারা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে ও তৎকালীন সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ করে। ৫ নভেম্বর খন্দকার মুশতাক পদত্যাগ করলে প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) এক "সিপাহী অভ্যুত্থানে" বিগ্রেডিয়ার মোশাররফ নিহত হন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা সুসংহত করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল ভগ্নস্বাস্থের অজুহাতে বিচারপতি সায়েমকে পদত্যাগ করিয়ে জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সরকারের বৈধকরণ ও বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে গণভোট, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এ সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর বেসামরিকীকরণের আরেকটি দিক ছিল রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত শক্তিশালী করা। সে লক্ষ্যেই ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জন্ম হয়েছিল। তবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে জেনারেল জিয়া নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক দলকেও আশ্রয় প্রশ্রয় দেন।

জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

জেনারেল জিয়া নিজ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চারিতার্থ করার জন্য সামরিক শাসন থেকে ধীরে ধীরে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। নিজের নেতৃত্বে ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায় থেকে দল গঠন করেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠান

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন, ১৯৭৭ : ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শুরু হয়। জিয়া সরকার এ নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেন। আগস্ট - সেপ্টেম্বর মাসে দেশের পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় নির্বাচনে সরকারি আনুকূল্যে ডানপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

গণভোট, ১৯৭৭ : সামরিক শাসনকে বৈধ করার লক্ষ্যে ৩০ মে, ১৯৭৭ বাংলাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ ভোটার অংশ এবং জিয়াউর রহমানের পক্ষে ৯৯ শতাংশ ভোট পরে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৭৮ : গণভোটে জয়লাভের এক বছর পরই দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ নির্বাচনের পূর্বেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতা শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়াও ভয় ছিল যে, যদি সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দল বিশেষত আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে তাহলে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু হতে পারে। ৩ জুন, ১৯৭৮ নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানীকে পরাজিত করে জিয়াউর রহমান

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনে জিয়াউর রহমান ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৭ ভোট এবং ওসমানী ৪৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ২ শত ভোট পায়। ১২ জুন ১৯৭৮ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। যথেষ্ট সময় না দিয়ে হঠাৎ করে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করায় বিরোধীদলগুলো নির্বাচন বর্জনের হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত সংসদের প্রথম অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে ২৯ টি রাজনৈতিক দল ও উপদল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩০০ টি আসনের মধ্যে বি এন পি ২০৭ টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ ৩৯ টি আসনে জয়ী হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসন বৈধকরণের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। তবে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

দলগঠন প্রক্রিয়া : সামরিক শাসনকে বৈধ করার জন্য দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা জিয়াউর রহমান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের সাথে ব্যক্তিগত এবং আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ রেখেছিলেন। এ সময় বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতাকারী চক্র জেনারেল জিয়াকে সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে তৎপর হন। এলক্ষে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) গঠন করা হয়। জিয়া নিজে সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার এবং মন্ত্রিসভার দশ জন সদস্য এ দলের নেতৃত্বে থাকেন। জাগদল পরবর্তীতে একটি ফ্রন্ট গঠন করে। পরে জিয়াউর রহমান ছয়টি রাজনৈতিক দলের জোট - 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট'র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৯'র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করা হয়। জিয়াউর রহমান এ সংগঠনের নেতৃত্বও গ্রহণ করেন।

এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। অন্যান্য সামরিক শাসকদের মতই এরশাদও জারিকৃত সামরিক শাসন অন্তর্বর্তীকালীন বলে ঘোষণা দেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে বলে আশ্বাস দেন। পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে, এরশাদের এ সব অঙ্গীকার সত্য ছিল না। বরং দখলকৃত ক্ষমতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রথাগত পথেই অগ্রসর হয়ে জিয়াউর রহমানের মতই উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। পূর্বের সামরিক শাসকের মত তিনিও নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং দলগঠনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ করেন।

গণভোট, মার্চ ১৯৮৫: ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল এরশাদ সংবিধান স্থগিত করে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সংবিধান স্থগিত থাকা সাপেক্ষে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এরশাদ ক্ষমতায় থাকবেন কি না এবং তাঁর গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন আছে কি না- তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ গণভোটের বিপক্ষে যে কোন প্রচারনা চালানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। যদিও এর পক্ষে প্রচারণাতে কোন বাধা ছিল না। এ নির্বাচনে ৯৪.১৪ ভাগ ভোটদানকারী এরশাদের সমর্থনে 'হাঁ' ভোট প্রদান করেন বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল।

উপজেলা নির্বাচন, মে ১৯৮৫: ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এরশাদ সরকার সারাদেশে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রচন্ড বিরোধীতার কারণে উপজেলা নির্বাচন তখনকার মত স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের মে মাসে বিরোধী দলগুলোর ব্যাপক অসন্তোষের মধ্যেও উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। গোলযোগপূর্ণ এ নির্বাচনের প্রার্থীরা সরাসরি দলীয় পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। এ ছাড়াও মোট ভোটারের অতি অল্প সংখ্যকই নির্বাচনে ভোট দান করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬ : উদ্দেশ্য প্রণোদিত বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার জন্য জেনারেল এরশাদ ধাপে ধাপে অগ্রসর হন। গণভোট এবং উপজেলা নির্বাচনের পর ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো নির্বাচনের ঘোষণা প্রত্যাখান করে এবং সামরিক শাসনের অবসান সহ নির্দলীয়- নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এমতাবস্থায় সরকার নির্বাচনের তারিখ ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল পুনঃধার্য করে। বিরোধী দলগুলো ঘোষিত নতুন তারিখও প্রত্যাখান করে একে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার ষড়যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করে। কিন্তু এরশাদ ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনে অংশ না নিলে সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হবে এবং আরো কঠিনভাবে সামরিক আইন প্রয়োগ করা হবে। এরূপ বাস্তবতায় সরকার বিরোধী ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের যুক্তি ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে এরশাদকে জয়ী হওয়ার সুযোগ দেওয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে না। জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, জাসদ সহ আরো কিছু দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতৃত্বাধীন ৭- দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৮৬

সালের ৭ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের দল ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে এ নির্বাচনও আদৌ অবাধ ও সুষ্ঠু হয় নি। দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সরকারী সন্ত্রাসযুক্ত এ নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় নি বলে মত দেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, অক্টোবর ১৯৮৬ : নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বেসামরিকীকরণের শেষ ধাপ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন স্থির হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় এবং বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দিন হরতালের ডাক দেয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে এরশাদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। যদিও তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ত্যাগ করেন নি। বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন ঘোষণা এবং আন্দোলন সত্ত্বেও নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন হয়। এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী রূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সরকারী ফলাফলে এরশাদ ৮৪% ভোট লাভ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়।

দলগঠন প্রক্রিয়া: সামরিক শাসনকে বৈধ করার জন্য নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজনীয়তা জেনারেল এরশাদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সে জন্যই ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর 'জনদল' গঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিভিন্ন দল থেকে বেরিয়ে আসা সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর পরিণতিতে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এরশাদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে 'জাতীয় পার্টি' গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৌশলগত কারণে এরশাদ জাতীয় পার্টির সাথে নিজেকে যুক্ত করেন নি। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে ১ সেপ্টেম্বর তিনি জাতীয় পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পরদিন এ দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ভাবেই এরশাদও সামরিকশাসনের বেসামরিকীকরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দলগঠন উভয় প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেন।

সারকথা

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে। এরপর দীর্ঘ দেড় দশক দুজন সামরিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হয়। উভয় শাসকই তাদের অবৈধ ক্ষমতা দখলকে বৈধ করা এবং দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন। রাজনৈতিক দল গঠন করে তারা সামরিক সরকারের বেসামরিকীকরণ করার চেষ্টা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে হত্যা করা হয়?
ক) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি খ) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
গ) ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঘ) ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর

২। জেনারেল এরশাদ কবে ক্ষমতা দখল করেন?
ক) ১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ খ) ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ
গ) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ঘ) ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ

৩। সামরিক শাসকরা বেসামরিকীকরণের জন্য কোন কোন পন্থা অবলম্বন করেন?
ক) গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা খ) নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দলগঠন।
গ) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করণ ঘ) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিমোচন

উত্তর মালা: ১। খ, ২। গ, ৩। খ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সামরিক শাসকদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান

জিয়াউর রহমানের পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশে দ্বিতীয় বার সামরিক শাসনের সূচনা করেন। তখন থেকে দীর্ঘ নয় বছর এরশাদের সামরিক একনায়কত্বের আওতায় বাংলাদেশ শাসিত হয়। এরশাদের শাসনকালে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়। এরশাদের সামরিক শাসন অবসানের জন্য এ দেশের মানুষকে ক্রমাগত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বহু মানুষ প্রাণদান করেছেন। অবশেষে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সফল গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। অবশ্য এই গণঅভ্যুত্থান হঠাৎ করে সংগঠিত হয় নি। এরশাদ শাসনের প্রথমদিক থেকেই সামরিক শাসন বিরোধী কার্যক্রম কখনো ধীরে কখনো প্রবলভাবে চলতে থাকে। নিচে সংক্ষেপে নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের অতীত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো:

১৯৮২ সালের শেষ দিক থেকেই ছাত্র সমাজ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শুরু করে। এরশাদ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীরা এ আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। উক্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট এবং সেপ্টেম্বর মাসে বি এন পি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। তখন থেকে এরশাদের পতন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনও আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। ১৯৮৭ সালে সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রবল হওয়া সত্ত্বেও এরশাদ ক্ষমতায় থাকতে সমর্থ হন।
১৯৯০ সালের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো মিছিল- মিটিং- হরতাল সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে থাকে। সারাদেশের ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোও সামরিক শাসন অবসানের আন্দোলনে সক্রিয় হয়। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট একাত্ম হয়ে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে । ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০ সামরিক পতনের লক্ষ্যে সরকার ৮,৭ এবং ৫ দলীয় জোট 'যৌথ ঘোষণা' প্রদান করে।

তিন জোটের যৌথ ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ

- বিরোধী দল এবং জোট কর্তৃক এরশাদের অধীনে সকল নির্বাচন বয়কট ও প্রতিরোধ;
- এরশাদের পদত্যাগ ও তত্তাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর;
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক নির্বাচন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা পুনরুদ্ধার ও সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা;
- অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদ এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

তিন জোটের যৌথ ঘোষণা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। জরুরি অবস্থা জারিসহ বিভিন্ন দমনমূলক পন্থা অবলম্বন করা হলেও আন্দোলন থেকে জনগণকে নিবৃত্ত করা যায় নি। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবি, সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ আন্দোলনের প্রতি সোচ্চার সমর্থন জানায়। বড় শহরগুলোতে হাজার হাজার লোক কারফিউ অমান্য করে রাস্তায় নেমে আসে। রেডিও- টেলিভিশনের শিল্পী,

সংবাদ পাঠকরা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম বর্জন করে। সর্বশেষে এরশাদের মূলশক্তি সামরিক বাহিনীও সমর্থন প্রত্যাহার করে। এমতাবস্থায় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। এরশাদের ক্ষমতা ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা : প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যেকার সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে যৌথ ঘোষণা প্রদানে সমর্থ হলে এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এর ফলে সারাদেশে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। সরকার ২৭ নভেম্বর, ১৯৯০ জরুরি অবস্থা জারি করে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে প্রধান শহরগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু এসব দমনপূর্বক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করা যায় নি। বরং বুদ্ধিজীবি-পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের লোকজন আন্দোলনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। জরুরি অবস্থা অমান্য করে জনগণ রাস্তায় নেমে এসে এরশাদের পদত্যাগের দাবী জানাতে থাকে। সর্বশেষে প্রধান অবলম্বন সামরিক বাহিনীও যখন সমর্থন প্রত্যাহার করে তখন নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করা ছাড়া এরশাদের অন্য কোন বিকল্প থাকে নি। ক্ষমতায় থাকার শেষ চেষ্টা হিসাবে এরশাদ - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০ কোন নিদিষ্ট তারিখ উল্লেখ ছাড়াই, একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। এবং নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে পদত্যাগের অঙ্গীকার করেন। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনগুলো এরশাদের এ ঘোষণাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার অপকৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করে এবং প্রত্যাখান করে। এমতাবস্থায় ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯০, এরশাদ অবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন। উক্ত পদে তিন-জোটের মনোনীত প্রার্থী তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। একই দিন এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন এবং বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে। এভাবেই এরশাদের অপশাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ যে, বাংলাদেশে অসামরিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের এটিই প্রথম নিদর্শন।

১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচন ও ফলাফল : ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহামদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণা দেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১। বিভিন্ন কারণে এ নির্বাচনে জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিস্থিতির কারণে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়।

৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ২৭৮৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৭৫টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রার্থী এবং দলের এ সংখ্যা বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে সর্বোচ্চ। রেকর্ড সংখ্যক ৪৭ জন মহিলা নির্বাচনে প্রার্থী হন। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তিনজন বিচারপতি অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। অভিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারদের বরখাস্ত করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনের হাতে সমর্পণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার সাপেক্ষে ১৬- দফা নির্বাচনী বিধি প্রণীত হয়। নির্বাচনে উত্তেজনা হ্রাস, সহিংসতা দমন ও কালো টাকার ব্যবহার বন্ধের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন আইন সংশোধন করে।

ফলাফল

অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫টি দল নির্বাচনে অংশ নিলেও প্রধান ৪টি দল ৯৩.৬৬ শতাংশ আসন লাভ করে। ৮৪ শতাংশ দল কোন আসন লাভ করে নি এবং কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নি। ভোটের ফলাফল নিচে সারণির সাহায্যে উল্লেখ করা হলো :

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

দল / স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত আগণ
বিএনপি	১৪০
আওয়ামী লীগ	৮৮
জাতীয় পার্টি	৩৫
জামায়াত- ই-ইসলামি	১৮

কম্যুনিস্ট পার্টি	৫
বাকশাল	৫
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর)	১
গণতন্ত্রী দল	১
ওয়ার্কার্স পার্টি	১
জাসদ (সিরাজ)	১
ইসলামী ঐক্য জোট	১
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১
স্বতন্ত্র	৩
মোট	**৩০০**

উৎস : নির্বাচন কমিশন

সারকথা

১৯৭৫ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'জন সেনা ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে গেছেন। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ এর সামরিক শাসনের সূচনা হলে তখন থেকেই এই অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ শাসনের অবসান ঘটে এবং নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক(√) দিন

১। জেনারেল এরশাদ কবে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন?
ক) ১৯৮৯ সালের ৬ ডিসেম্বর
খ) ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর
গ) ১৯৯১ সালের ৬ ডিসেম্বর
ঘ) ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর

২। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর
খ) ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল
ঘ) ১৯৯১ সালের ২ জুলাই

৩। জেনারেল এরশাদের শাসনব্যবস্থা কি ধরনের ছিল?
ক) গণতান্ত্রিক
খ) সমাজতান্ত্রিক
গ) সাম্যবাদী
ঘ) স্বৈরতন্ত্রী

উত্তরঃ ১. খ; ২.খ ৩.ঘ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও রাজনীতি, ১৯৯১-২০০১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন;
- ১৯৯১-১৯৯৬ সালের বিএনপি'র ক্ষমতাকাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ১৯৯৬-২০০০ সালের আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকাল বর্ণনা দিতে পারবেন।

সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন

একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শোষণের বিরোধিতা করে। এবং এই বিরোধিতারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গণতন্ত্রের অভিমুখে বাঙালি জাতির অভিযাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫-১৯৯০ সাল মেয়াদের শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী গণতন্ত্রহীনতাকে কখনোই খুশী মনে মেনে নেয়নি। বরং পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেই আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিরোধের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসনকে সর্বদাই প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। বাঙালির এই প্রতিরোধের সংস্কৃতিকে, ১৯৯০ সালের সামরিক শাসনের অবসান এবং সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়াও সে সময়কালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কিছু গুণগত পরিবর্তন প্রান্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনীতির উপর অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রভাব ফেলে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, শক্তিধর পুঁজিবাদী বিশ্বের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক শাসকদের উপস্থিতি অনেকটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া ইত্যাদি সব কারণ মিলে বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য ধাঁচের পুঁজিবাদী-উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। বাংলাদেশেও এই প্রবণতার ব্যতিক্রম হয় নি। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়ে যে, বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনুকূল পরিবেশই মূলত ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসন অবসান এবং পরবর্তীতে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব করে তোলে। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, আদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যাপক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ডান-বাম-মধ্যপন্থী এমনকি ধর্মনির্ভর দলগুলো একটি ইস্যুতে অর্থাৎ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সামরিক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর ও একই কর্তৃপক্ষের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে, ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

১৯৯১-২০০১ সময়সীমায় তিনটি সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু এই সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হয়।

বিএনপি আমল, ১৯৯১-১৯৯৬

১৯৯১ সালের ২৭ ফেরুয়ারি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে-বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা সূচিত হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে বিএনপি সরকার গঠনের কৃতিত্ব অর্জন করে। অন্যান্য দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও নৌকা মার্কা প্রতীকধারীরা ১০০ টি, জাতীয় পার্টি ৩৫ টি এবং জামায়াত-ই-ইসলামি ১৮ টি আসন লাভ করে। ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (সিরাজ), এনডিপি, ইসলামি ঐক্যজোট প্রত্যেকে ১টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়। এ নির্বাচনে মোট ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলেও সরকারি দল এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রায় সকল ইস্যুতে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ সংসদ বয়কটের (বিরোধীদল কর্তৃক) মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফল পরিচালনার জন্য পরিমিত মাত্রার মতানৈক্য আবশ্যক। কিন্তু একদিকে উপ-নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দলগুলোর টানা সংসদ অধিবেশন বর্জন,

রাজপথে আন্দোলন, এক কথায় সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহের মধ্যে সংসদীয় রাজনীতি লালনে ব্যর্থতায় সামরিক শাসন উত্তর সংসদীয় ব্যবস্থায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ, মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকে। উক্ত উপ-নির্বাচনে বি.এন.পি. ভোট কারচুপী করেছিল বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিরোধী দলগুলো আর কোন উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেয়। এ ছাড়াও ৩০ মার্চ থেকে বিরোধী দলগুলো সংসদ বর্জন শুরু করে। পরবর্তীতে, একই বছর ২৮ ডিসেম্বর ১৪৭ জন সাংসদ একযোগে পদত্যাগের ঘোষণার ফলে পঞ্চম জাতীয় সংসদ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘদিন বিরোধী দলবিহীন সংসদ চলার পর ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় এবং নির্বাচনের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৩০ মার্চ, বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করায় বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই নির্বাচন কোন গুরুত্ব বহন করে না।

এটি ঠিক যে, পূর্বে উল্লেখিত নানাবিধ সমস্যাগুলো সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিকে পদে পদে বিঘ্নিত করেছিল। আবার এটিও উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক শাসন পরবর্তী প্রথম বেসামরিক সরকার, অর্থাৎ বিএনপি শাসনামলে, এমন কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছিলো যেগুলো বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নিম্নে এদের কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন

ক্ষমতা লাভের অল্প সময়ের মধ্যে, সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দলমত নির্বিশেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে, সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃসূচনাকে বিএনপি শাসনামলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নির্বাচনে জয়লাভের পর, ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং পরদিন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করেন। সরকার গঠনের পর, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, চতুর্থ সংশোধনীর আওতায় প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং মুক্তিযুদ্ধের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হয়। যদিও এ দাবি বি.এন.পি'র নির্বাচনী ইস্তিহারে ছিলনা। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী শুধু যে সরকার পদ্ধতিরই পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, এই সংশোধনী প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হওয়ার অনন্য নজিরও স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংসদে বিরোধী দলের উপনেতার পক্ষ থেকে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এবং সরকারি দলসহ অন্যান্য দলগুলো জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন

বিএনপি সরকারের শাসনামলের শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধানকে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। বরং তা ছিল সামরিক শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি অস্থায়ী ফর্মুলা। কিন্তু সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ধারণাটি একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। নতুন আইন অনুযায়ী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ আইন অনুসারে সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া বা মেয়াদ অতিক্রমের ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১ জন প্রধান উপদেষ্টা ও সর্বোচ্চ ১০ জন অন্যান্য উপদেষ্টা) নিযুক্তির বিধান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। বিধান অনুসারে, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকবে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ প্রদানের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসহিষ্ণু মনোভাবের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে, তথাপি এটুকু বলা যায় যে– অন্তর্বর্তীকালীন একটি ব্যবস্থা হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ফলে, তাত্ত্বিকভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আওয়ামী লীগ আমল, ১৯৯৬-২০০১

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৪৬ টি আসনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অন্যান্য দলের মধ্যে বিএনপি ১১৬ টি, জাতীয় পার্টি ৩২ টি, জামায়াত-ই- ইসলামি ৩টি, জাসদ (রব) ১ টি ও ইসলামি ঐক্যজোট ১

টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে মাত্র ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভে সমর্থ হন। উক্ত প্রার্থীর আওয়ামী লীগে যোগদান এবং জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ও জাসদ (রব) এর সমর্থন লাভের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ঐকমত্যের সরকার গঠন করে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

- নির্দলীয় ব্যক্তি হিসাবে ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগদান।
- জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রশ্ন-উত্তর পর্বের সূচনা। এ ছাড়াও রয়েছে, মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের সভাপতি করে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন।
- ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি-বণ্টন চুক্তি (১৯৯৬) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর সাথে শান্তিচুক্তি (১৯৯৭) স্বাক্ষর।
- স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের মাধ্যমে চারস্তর বিশিষ্ট, যথা গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রহণ।
- সংসদে কমিটি প্রথার উপর গুরুত্বারোপ।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বয়স্কভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা প্রবর্তন ইত্যাদি।

সারকথা

১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা সূচিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠনের কৃতিত্ব অর্জন করে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) এর সমর্থন লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নৈর্বাচনী উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন কোন সালে ঘটে?
ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯১
গ. ১৯৯২ ঘ. ১৯৯৩

২। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ খ. ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
গ. ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ঘ. ১২ জুন ১৯৯৬

৩। জেনারেল এরশাদ কবে পদত্যাগ করেন?
ক. ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ খ. ৪ ডিসেম্বর ১৯৯০
গ. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ঘ. ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

উত্তর : ১। খ; ২। খ; ৩। গ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধানগুলো আলোচনা করুন।

তথ্য উৎস

১। *Chowdhury Mahfuzul H. (ed), 2002, Thirty Years of Bangladesh, Dhaka. UPL : Bangladesh।*
২। *হারুন-অর-রশিদ, ২০০১, বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০. নিউএজ: বাংলাদেশ।*
৩। *Hakim M.A, 1993. Bangldesh Politics : The Shahabuddin Interregnum, Dhaka.UPL: Bangladesh।*